স্বপ্ন ব্যাখ্যা – সিগ্মুন্ড ফ্রয়েড ও গিরীন্দ্রশেখর বসু

সোনালী চট্টোপাধ্যায়

ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন আমরা প্রায় সবাই দেখি এবং স্বপ্নের ব্যাখা নিয়ে আমাদের কৌতূহলেরও শেষ নেই। সুদূর অতীতকাল থেকে পৃথিবীতে সর্বস্তরের মানুষ স্বপ্নকে নানানভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। আমাদের সমাজেও স্বপ্ন নিয়ে বিভিন্ন লৌকিক মত প্রচলিত আছে। কিন্তু তার বেশির ভাগই মানুষের কল্পনা এবং প্রায় সবগুলোতেই স্বপ্নকে অতিমানবিক বা দেবতা বা দানবদের প্রভাব হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অ্যারিস্টটল প্রথম স্বপ্ন নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে মানুষের মনের ক্রিয়াকলাপের ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। এর পরেও অনেক দার্শনিক ও মনোবিদ স্বপ্ন নিয়ে নানান ধরনের ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিকভাবে স্বপ্নকে ব্যাখ্যা করেন মনস্তত্ত্ববিদ সিগ্মুন্ড ফ্রয়েড।

সিগ্মুন্ড ফ্রয়েড (১৮৫৬-১৯৩৯) আমাদের কাছে তাঁর নিজস্ব মনোবিশ্লেষণের তত্ত্বের জন্য অত্যন্ত সুপরিচিত। প্রথম জীবনে ডাক্তারি পাশ করে ১৮৮৫ থেকে ১৮৮৬ সাল পর্যন্ত ফ্রয়েড প্রখ্যাত ফরাসী নিউরোলজিস্ট জাঁ মার্টিন শার্কো-এর সঙ্গে প্যারিসে কাজ করেন এবং হিপনোটিজম নিয়ে গবেষণা করেন। শার্কো তখন হিস্টিরিয়া নামক অসুখের চিকিৎসাতে ব্যস্ত এবং চিকিৎসা-পদ্ধতি হিসেবে হিপনোটিজম নিয়ে নানান রকম পরীক্ষা করছিলেন। তিনি হিস্টিরিয়াকে এক ধরনের নার্ভ সংক্রান্ত অসুখ বলে সিদ্ধান্ত করেছিলেন। কিন্তু ক্রমে বোঝা গেল এই অসুখের শারীরিক লক্ষণগুলোর পেছনে রোগীর কিছু চিন্তা-ভাবনা দায়ী যে চিন্তা-ভাবনাগুলো কখনোই রোগী সচেতন মনে বুঝতে পারেন না। ফ্রয়েড বুঝতে পারেন আমাদের মনে যে চিন্তা-ভাবনাগুলো ঘুরে বেড়ায় সেগুলোই সব নয়, তার গভীরেও কিছু চিন্তা ভাবনা আছে।

এই একই সময়ে ভিয়েনা শহরের আরেকজন সুচিকিৎসক জোসেফ ব্রয়ারও হিস্টিরিয়া রোগের চিকিৎসা করছিলেন। ১৮৮৬ সালে ফ্রয়েড ভিয়েনা শহরে ফিরে স্নায়ুরোগের চিকিৎসক হিসেবে প্রাইভেট প্র্যাকটিস শুরু করেন। সাথে জোসেফ ব্রয়ারের সহযোগী হিসেবেও কাজ শুরু করেন। ব্রয়ার একজন বিশেষ হিস্টিরিয়া রোগীকে নিয়ে কাজ করছিলেন। ব্রয়ার দেখলেন সেই বিশেষ রোগী অনেক কিছু বলতে চান। হিপনোটাইজড অবস্থাতে হয়ত আরও অনেক মনের কথা বেরিয়ে

আসতে পারে এই ভেবে ব্রয়ার প্রথমে এই পদ্ধতির সাহায্য নেন। এই অবস্থায় কথা বলতে বলতে ছোটবেলায় ঘটা কিছু লজ্জা, ঘৃণার ঘটনা বেরিয়ে পড়ে এবং মনের চাপা দুঃখ কষ্ট চিকিৎসকের কাছে সব উজাড় করতে পেরে রোগী কিছুটা হালকা বোধ করেন এবং তাঁর অসুখ থেকে মুক্তিও ঘটে। ব্রয়ার ও ফ্রয়েড এই পদ্ধতির নাম দেন cathartic treatment.

কিন্তু ক্রমে ফ্রয়েড দেখলেন যে রোগীকে যদি একটু আরাম করে হাত পা এলিয়ে শুইয়ে দিয়ে বিনা প্রশ্নে কথা বলতে দেওয়া হয় তবে রোগীর মনের অনেক কথা এমনিই বেরিয়ে আসছে এবং হিপনোটাইজড পদ্ধতির দরকার পড়ছে না। যত সে কথা বলছে তত তার অসুখের লক্ষণগুলো কমছে। এই কথার মধ্য দিয়ে ছোটবেলায় ঘটা কিছু লজ্জা, ঘৃণার ঘটনা ছাড়াও অনেক দরকারি-অদরকারি, ন্যায্য-অন্যায্য, অবান্তর কথাও বেরিয়ে পড়ছে যা প্রাথমিকভাবে অর্থহীন মনে হলেও ধীরে ধীরে সেগুলি বিশ্লেষণ করলে রোগীর মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে ধারণা সুস্পষ্ট হয়। এই পদ্ধতিতে এমন সব চিন্তা সামনে আসতে লাগল যেগুলো রোগীর সজ্ঞানে কখনোই আসেনি। এই জায়গা থেকেই ফ্রয়েডের কাছে সুস্পষ্ট হয় আমাদের অবচেতন মনের ধারণা। এই পদ্ধতিতে রোগী অবাধে কথা বলে যান বলে এই পদ্ধতি অবাধ ভাবানুষঙ্গ বা Free association নামে পরিচিত। এমনকি এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে রোগের উৎসের সন্ধানও পাওয়া যায়।

বলা যেতে পারে Free association পদ্ধতির আবিষ্কারের ফলেই Psychoanalysis প্রক্রিয়ার জন্ম। Free association পদ্ধতির মাধ্যমে ফ্রয়েড আরও বেশি করে মানুষের অবচেতন মনের চিন্তা-পদ্ধতি জানার চেষ্টা করতে থাকেন। ফ্রয়েডের কাছে একটা বিষয় পরিষ্কার হয় যে অবচেতন চিন্তা-ভাবনার মূলে কিছু যৌন চাহিদা বা অপ্রীতিকর যৌন ক্রিয়ার স্মৃতি রয়েছে যা চেতন মন থেকে চলে গেলেও অবচেতন মনে রয়ে গেছে এবং এখান থেকেই রোগ তৈরি হচ্ছে। আবার কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেল রোগীর অবচেতন মনে যৌন লাঞ্ছনার চিন্তা থাকলেও বাস্তবে তার সঙ্গে ওরকম কোনো ঘটনা ঘটেনি কখনোই। এই স্মৃতি সম্পূর্ণ রোগীর কাল্পনিক। তাহলে মানুষের অবচেতন মন কোন দিকে বয়ে চলে? এই অবচেতন মনের উপাদানগুলোই বা কী? ফ্রয়েড বুঝতে পারেন অবচেতন মনে এমন সমস্ত চিন্তা থাকে যা সহজে চেতন মনে বেরিয়ে আসতে পারে না। এই অবদমিত, বা অবচেতনে থাকা চিন্তার সামনে কোনো দারোয়ান আছে যা এই চিন্তাগুলোকে সহজে সচেতন হতে দেয় না। অবাধ ভাবানুষঙ্গ পদ্ধতিতে এই দারোয়ানের অজান্তেই ধীরে ধীরে মনের অতলে সযত্নে লুকিয়ে রাখা চিন্তাগুলো নানান রকম ছদ্মবেশে বেরিয়ে আসতে পারে।

এইভাবেই আবিষ্কার হয় অবচেতন মনের অস্তিত্ব। আমাদের মনের যেসব কথা,

চিন্তা আমরা ভুলে গেছি বলে মনে করি বা এমন কিছু কথা যেগুলো আমরা চাই না আমাদের চেতন মনে আসুক — হতে পারে সেগুলোর সঙ্গে আমাদের লজ্জা, অপমান, কষ্ট মিশে আছে — সেগুলোকে আমরা অবদমিত ভাবে রাখতেই চাই। কিন্তু কখনো কখনো এই অবদমিত চিন্তাই আমাদের মনের অসুখ তৈরি করে। আমাদের মনের চেতন স্তর হল আমাদের সজাগ অবস্থার কথা, চিন্তা। আর এই চেতন স্তর আর অবচেতন স্তরের যোগসূত্র ঘটায় আমাদের প্রাক-চেতন মন। যেসব কথা বা চিন্তা চেতন মনে ছিল কিন্তু এখন নেই অথচ একটু চেষ্টা করলে চেতন মনে আনা যেতে পারে সেগুলোই এই প্রাক-চেতন স্তরে থাকে।

আমরা ব্যাপারটাকে আরও সহজভাবে বুঝতে পারি। ধরা যাক একটা বড় ঘর। সেই বড় ঘরের লাগোয়া একটা মাঝারি ঘর। আর এই মাঝারি ঘরের লাগোয়া আরেকটা ছোট ঘর। বড় ঘর থেকে মাঝারি ঘরে, আবার মাঝারি ঘর থেকে ছোট ঘরে যাওয়া যাবে কিন্তু দুটি ঘরের দরজাতেই দারোয়ান বসে। ছোট ঘরের সঙ্গে বাইরের দুনিয়ার যোগাযোগ। এখন বড় ঘরে যারা আছে তারা কিন্তু চাইলেই ছোট ঘরে আসতে পারবে না। তাদের আসতে গেলে দারোয়ানকে পেরোতে হবে। তেমনি মাঝারি ঘর থেকে ছোট ঘরে আসতে গেলেও দারোয়ানকে পেরোতে হবে। ছোট ঘরের মালিক যে মানে আমি যদি মনে করি বড় ঘরের মানুষগুলো বাইরে বেরিয়ে এলে আমার খুব মুশকিল হবে তাহলে দারোয়ান কিছুতেই সেই মানুষগুলোকে বেরোতে দেবে না। এমনকি দৈনন্দিন জগতে যদি খুব লজ্জাজনক ঘটনা ঘটে যেটা আমি চাই না যে আমার সঙ্গে ঘটুক, সেই ঘটনার স্মৃতিকেও আমরা বড় ঘরে ঠেলে পাঠিয়ে দিই।

এই যে ফ্রয়েড মানুষের অবচেতন মনের সন্ধান পেলেন, এর ফলে অবচেতন মনের উপাদান নিয়ে ফ্রয়েড গবেষণা শুরু করলেন। উনি বুঝতে পারলেন খুব শিশুকাল থেকে ঘটা কিছু লজ্জাকর ঘটনা, যৌন লাঞ্ছনা অবদমিত হয়ে অবচেতন মনে চলে যায় অথবা আপনা আপনি উদয় হওয়া কিছু কাম প্রবৃত্তি যা বাইরে আসতে পারে না সেগুলো এই অবচেতন স্তরে থেকে যায়। শিশুর জন্মগত কাম চেতনা থাকে বলেই হঠাৎ কোনো যৌন লাঞ্ছনা ঘটলে তার মনে গভীর রেখাপাত করে। ঐ যে দারোয়ানের কথা বললাম তা হল আমাদের বিবেক যা বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সামাজিক শিক্ষার ফলে তৈরি হয়।

এই প্রসঙ্গে আরও তত্ত্বের উপস্থাপনা ঘটে। চেতন, প্রাক-চেতন ও অবচেতন মনের স্তর আবিষ্কার হওয়ার সাথে সাথে এল ইদ, ইগো ও সুপার ইগোর ধারণা। ইদ হল আমাদের আদিম ইচ্ছা বা কামনা। আমরা ইদ বা একরাশ কামনা বাসনা নিয়ে জন্মাই এবং সারাজীবন ইদ আমাদের মনে বিভিন্ন কামনা বাসনার খেলা তৈরি করে চলে। এরপর আমাদের বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আসে ইগো বা আমিত্বের অস্তিত্ব।

তারপরে সামাজিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় তৈরি হয় আমাদের বিবেক বা সুপার ইগো। এটাকেই ফ্রয়েডের Topographical Model বলে।

এই ইদ-এর অবস্থান আমাদের মনের বড় ঘরে মানে অবচেতন মনে, আর এখান থেকেই সে নানা রকম চাহিদা আমাদের সচেতন মনে পাঠাতে থাকে। সুপার ইগো থাকে প্রাক-চেতন ও অবচেতনের ঘর জুড়ে। আর ইগো মূল সিদ্ধান্ত নেবে ও কাজ করবে তাই সে থাকে আমাদের সম্পূর্ণ চেতন মন অধিকার করে আর তার সঙ্গে কিছুটা প্রাক-চেতনে ও কিছুটা অবচেতনে। এই হল তিনটি মনের স্তরের সঙ্গে ইদ, ইগো আর সুপার ইগোর সম্পর্ক। ইগো, ইদ-এর চাহিদা ও সুপার ইগোর শাসনের মাঝে ভারসাম্য রক্ষা করে সিদ্ধান্ত নেয়। এই ভারসাম্য রক্ষা করতে আমাদের ইগো কী ধরনের প্রতিরক্ষণ কৌশল ব্যবহার করছে তারও ব্যাখ্যা ফ্রয়েড করলেন।

ফ্রয়েডের মতে আমাদের মনে সতত বিরাজমান জন্মগত আদিম কামনা বাসনা ও আগ্রাসী মনোভাব। এই আদিম কামনা বাসনা বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেন জন্মাবস্থা থেকে বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে এই অবচেতন মনের কামজ ইচ্ছাগুলো কীভাবে তৈরি হয় এবং আমাদের শারীরিক বয়স বাড়ার সাথে সাথে কীভাবে এই অজ্ঞাত যৌন ভাবনার পরিবর্তন হয় ও এই পরিবর্তন কীভাবে আমাদের ব্যক্তিত্বকে গড়ে তোলে। আমাদের এই পরিবর্তন বা মনের বেড়ে ওঠা বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করে বুঝিয়েছেন।

ফ্রয়েড দেখলেন যে অবাধ অনুষঙ্গে এই অবদমিত কামনা বাসনা বা নানান ধরনের অবদমিত চিন্তারা বেরিয়ে আসতে পারে। এবং যত বেরিয়ে আসে এবং মানুষ যত সেটা বুঝতে পারে তত সে তার মনের কষ্ট থেকে মুক্তি পায়। এইরকমই স্বপ্নের মাধ্যমেও এই অবদমিত চিন্তারা বেরিয়ে আসতে পারে। ১৮৯০ সালে ফ্রয়েড তাঁর বাবাকে হারান। এই সময় ফ্রয়েড ব্যক্তিগত জীবনে কিছু সমস্যার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। ব্রয়ার-এর সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি, পেশাগতভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং বাবার মৃত্যু। এই সময়ে তিনি নিজেকে বিশ্লেষণ করতে শুরু করেন এবং নিজের স্বপ্নকে ব্যাখ্যা করতে শুরু করেন। ক্রমে তাঁর নিজের রোগীদের স্বপ্ন ব্যাখ্যা শুরু করেন। এর ফলস্বরূপ ১৯০০ সালে প্রকাশিত হয় 'ইন্টারপ্রিটেশন অফ ড্রিমস' ।

ফ্রয়েডের এই স্বপ্ন বিশ্লেষণ তত্ত্বে স্বপ্ন ব্যাখ্যার মুলত দুধরনের পদ্ধতির কথা বলেছেন। প্রথমত, সমগ্র স্বপ্নকে একটি প্রতীক হিসেবে নেওয়া এবং দ্বিতীয়ত, সমগ্র স্বপ্নের বিভিন্ন অংশকে প্রতীক হিসেবে নেওয়া। তবে ফ্রয়েড স্বপ্নকে টুকরো টুকরোভাবে বিশ্লেষণ করার পক্ষে এবং এইভাবে তিনি প্রায় এক হাজার স্বপ্নের বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু এ জন্য যার স্বপ্ন ব্যাখ্যা করছি তাকে খুব ভালভাবে জানতে

হবে। তার প্রতিদিনের ঘটনা, তার চেতন মনের চিন্তা ভাবনা, তার ছোটবেলা থেকে বর্তমান জীবন — সব। ফ্রয়েডের মতে স্বপ্ন উদ্ভট বা অর্থহীন নয়। স্বপ্নের অর্থ এই নয় যে আমাদের চিন্তা ভান্ডারের এক অংশ ঘুমিয়ে আছে এবং অপর অংশ জেগে উঠেছে। স্বপ্ন সম্পূর্ণ একটা মানসিক ঘটনা — স্বপ্ন হল আমাদের ইচ্ছার পূর্ণতা পাওয়া। এই তত্ত্ব প্রমাণ করতে তাঁর বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ে অনেকগুলো স্বপ্নের কথা উল্লেখ করেছেন। ফ্রয়েডের মতে স্বপ্ন দেখায় আমাদের দুইটি লাভ হয়। এক, আমাদের মনের অনেক অসম্পূর্ণ ইচ্ছা কাল্পনিকভাবে পরিতৃপ্ত হয়ে মনে শান্তি আসে, দুই, অনেকক্ষেত্রে ঘুমের ব্যাঘাত দূর হয়।

অবাধ অনুষঙ্গ পদ্ধতিই কিন্তু স্বপ্ন ব্যাখ্যার মূল হাতিয়ার। স্বপ্ন যে দেখছে সে স্বপ্ন দেখে, ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই স্বপ্নটা লিখে ফেলবে। স্বপ্ন আমরা খুব দ্রুত ভুলে যাই। তাই সঙ্গে সঙ্গে লিখে ফেলা খুব জরুরি। তারপর এই স্বপ্নের সঙ্গে জড়িত বাস্তবে কোনোরকম ঘটনা ঘটেছিল কিনা সেটা জানার চেষ্টা করা হয়। সমকালীন ঘটনাবলী স্বপ্নের অন্যতম উৎস। কেন এই রকম স্বপ্ন দেখলাম, স্বপ্নে দেখা মানুষগুলির সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক, বা যে জায়গাগুলো দেখলাম সেইরকম জায়গাতে গেছি কিনা বা ছবি দেখেছি কিনা এই সব তথ্যই জরুরি।

এবার অবাধ অনুষঙ্গ পদ্ধতি ব্যবহার করে এই স্বপ্ন সংক্রান্ত আরও তথ্য জানার চেষ্টা হবে। স্বপ্নটি বড় হলে তাকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে নিতে হবে। যিনি স্বপ্ন দেখেছেন তিনি আরাম করে চোখ বুজে সমস্ত শরীরকে ছেড়ে দিয়ে শোবেন বা হেলান দিয়ে বসবেন। যিনি ব্যাখ্যাকার তিনি মাথার কাছে বসে স্বপ্নের এক একটা অংশ বলবেন। যিনি স্বপ্ন দেখেছেন তিনি ওই স্বপ্নের অংশ শুনে তাঁর মনে কী ভাব বা কথা বা শব্দ আসছে সেটা ব্যাখ্যাকারকে বলবেন। কোনো রেখে ঢেকে নয়। উচিত-অনুচিত, শ্লীল-অশ্লীল — সব কথাই যেমন মনে আসবে বলে যাবেন। ব্যাখ্যাকারী সব লিখে নেবেন। এবং এই সমস্ত তথ্যই কিন্তু দরকার স্বপ্নটিকে ব্যাখ্যা করতে।

স্বপ্নে যা দেখা যায় তাকে ফ্রয়েড নাম দিয়েছেন Manifest Content বা ব্যক্ত অংশ এবং স্বপ্নের সঙ্গে জড়িত মনের আর যে সব চিন্তা বা শব্দ বা ভাব অবাধ অনুষঙ্গে পাওয়া যায় তাকে বলা হয় Latent content বা অব্যক্ত অংশ। এই অব্যক্ত অংশের সন্ধান না মিললে স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।

ফ্রয়েডের মতে আমাদের অনেক অসামাজিক ও অন্যায় ইচ্ছা অবচেতন মনে অবদমিত থাকে। এই সমস্ত ইচ্ছা আমরা জানতে বা বুঝতে পারি না। এই অবদমিত ইচ্ছাগুলোই অনেকসময় স্বপ্নে কাল্পনিকভাবে পরিতৃপ্তি লাভের চেষ্টা করে। যেমন, বাবার প্রতি ভালবাসার ভাব যেমন মানুষের মনে থাকে তেমন বাবার প্রতি রাগ বা ঘৃণাও মনের অতলে থাকতে পারে। কিন্তু সমাজ যেহেতু আমাদের শেখায় বাবাকে

সম্মান করতে হয়, তাই মনের স্তরের ঐ যে দারোয়ান এই রাগ বা ঘৃণার কথা চেতন মনে আসতে দেয় না। এর ফলস্বরূপ হয়তো আমি স্বপ্নে দেখলাম আমার কোনো পরিচিত ব্যাক্তির বাবার কোনো দুর্ঘটনা ঘটল বা বিপদ হল।

অর্থাৎ মনের অবদমিত ইচ্ছা মানেই যে তা সুখকর ইচ্ছা হবেই এমন কোনো কথা নেই। হয়তো কোনো কারণে মনের মধ্যে পাপবোধের সঞ্চার হয়েছে — সেক্ষেত্রে স্বপ্নে নিজের কোনও ক্ষতি হচ্ছে বা এমন কিছু কাজ করতে চাইছি কিন্তু কিছুতেই করতে পারছি না এমন — বারবার ব্যর্থ হচ্ছি এমন স্বপ্ন আমরা দেখে থাকি।

স্বপ্নের মধ্যে অনেকগুলো ঘটনা যেন একের সঙ্গে আরেকটা জড়িয়ে একটা নাটকের মত বা সিনেমার মত উপস্থাপিত হয় (Dramatization)। এইসব ঘটনার একটা সূত্র থাকে যেটাকে খুঁজে বার করতে হয়। অবদমিত ইচ্ছেটি পূরণ হবার জন্য অনেক চিন্তা-জালের প্রয়োজন হয় দারোয়ানকে ধোঁকা দেবার জন্য। এই দারোয়ান যেমনভাবে আসতে দেবে তেমন রূপ ও ভাব নিয়ে নেয় চিন্তারা (Displacement) এবং এইসব রূপ নিতে গিয়ে একটার সঙ্গে একটা গেঁথে যায় মালার মত (Condensation)।

আর এই ছদ্মবেশ হল বিভিন্ন প্রতীক (Symbolization)। এই প্রতীক বুঝতে আমাদের সমাজ জানতে হবে, ইতিহাস জানতে হবে, লোকগাথা জানতে হবে। ফ্রয়েড অনেকগুলো প্রতীকের কথা বলেছেন। যেমন — রাজা ও রানী — বাবা ও মায়ের প্রতীক। রাজকুমার বা রাজকুমারী নিজেকে বোঝায়। লম্বা ধরনের কোনো জিনিস যেমন ছুরি, গাছের গুঁড়ি, ছাতা ইত্যাদি পুরুষ জননেন্দ্রিয়ের প্রতীক। আবার বাক্স, কাপ বোর্ড চুল্লী জরায়ুর প্রতীক। কোনো ফাঁকা জিনিস যেমন জাহাজ, স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ের প্রতীক। কাঠ, কোঠা, ঘর ইত্যাদি নারী বোঝায়। মই বা সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা হস্ত মৈথুনের প্রতীক। শূন্যে ভাসতে দেখলে যৌন উত্তেজনা বোঝায়। জল — জন্মের প্রতীক। জলে সাতার কাটা — মা ও সন্তানের প্রতীক। ক্ষুদ্র প্রাণী — শিশুর প্রতীক।

মনের উদ্বেগ অবস্থা বোঝাতে ফ্রয়েড উলঙ্গ অবস্থায় আছি এমন স্বপ্ন, অতি প্রিয়জন মারা গেলেন এমন স্বপ্ন এবং পরীক্ষায় ফেল করার স্বপ্ন ব্যাখ্যা করেন। মনে প্রশ্ন আসতে পারে নিজেকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখা কি কারোর মনের ইচ্ছা হতে পারে? স্বপ্নটা এইরকম — যেন আমি উলঙ্গ অবস্থায় ঘুরছি। নিজে লজ্জা বোধ করছি, কিন্তু আমার আশেপাশের লোকজন আমার এই ব্যপারটা পাত্তাও দিচ্ছে না। আসলে ফ্রয়েড বলেছেন এর উৎস আমাদের একদম ছোটবেলা। ছোটবেলাতে যখন আমরা উলঙ্গ থাকি সেটা খুব স্বাভাবিক হয়। সেই ছোটবেলাতে আমাদের বড়রা বকে না শাস্তি দেয় না। বরঞ্চ আমরা যেমন স্বাভাবিক বড়রা সেটাই গ্রহণ করেন। অর্থাৎ আমরা চাই আমাদের মনের স্বাভাবিকতা প্রকাশ করতে যা আমার চারপাশের

মানুষজন সমালোচনা না করে গ্রহণ করবেন।

ফ্রয়েডের এই স্বপ্ন নিয়ে গবেষণা শুধুমাত্র ফ্রয়েডের পরবর্তী চিন্তাধারাকে উন্মুক্ত করতে সাহায্য করেনি এই গবেষণা সম্পূর্ণ মনোবিজ্ঞানের ইতিহাসে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ফ্রয়েডের Interpretation of Dreams প্রথমেই সবার কাছে সমাদৃত হয়নি। পরের বছরই ফ্রয়েড লেখেন "অন ড্রিমস" ('On Dreams' — 1901)। আমাদের সচেতন মনের গভীরে যে অবচেতন মন থাকতে পারে এবং সেখানে নানারকম অসামাজিক চিন্তা-ভাবনা জন্ম নিতে পারে মানুষের এই ধারণাতে বিশ্বাস আসতে সময় লেগেছে। এর পরেই ফ্রয়েড লেখেন 'The Psychology Of Everyday Life' এবং এটি মানুষের কাছে খুবই সমাদৃত হয়েছিল। ক্রমে এই Interpretation of Dreams বইটিও বহুল জনপ্রিয়তা পায়। যদি আমরা ভাবি মানুষের চিন্তা-ভাবনার জগতে মনোবিজ্ঞানের পরিসর তৈরি করতে কোনো কোনো বই-এর ভূমিকা অপরিসীম তাহলে অবশ্যই ফ্রয়েডের এই Interpretation of Dreams এবং The Psychology Of Everyday Life এই দুটি বই-এর নাম করতে হবে। তবে Interpretation of Dreams বইটি নিয়ে যতটা আলোচনা হয়েছে বা শোরগোল পড়েছে তা হয়তো ফ্রয়েডের আর কোনো বইকে নিয়ে হয়নি। এই বইটি আমাদের মনের এক অজ্ঞাত দিককে আমাদের সামনে আয়নার মত দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। ফ্রয়েড-পরবর্তীকালে ফ্রয়েডের তত্ত্বের নানান পর্যায়কে কেন্দ্র করে মনোবিজ্ঞানীরা নতুন গবেষণার ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করেছেন। বেশ কিছু বিজ্ঞানী ফ্রয়েডকে গ্রহণ করেছেন আবার ফ্রয়েডের তত্ত্ব থেকে কিছুটা সরে গিয়ে তাঁদের নিজস্ব মতকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। যেমন — অ্যাডলার, কার্ল ইয়ুং, মেলেনি ক্লেইন প্রমুখ ব্যক্তির নাম বলা যেতে পারে। তার ফলে এই বইটির প্রতি মানুষের কৌতূহলেরও শেষ নেই। আবার ফ্রয়েডকে নস্যাৎ করে মানবতা ধর্মী তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা হয়েছে যেখানে মানুষকে জন্মগতভাবে ভাল হিসেবে দেখা হয়েছে। কিন্তু এটা বলা যেতেই পারে ফ্রয়েডের গবেষণা মনোবিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

১৯৫০ সালে REM Sleep আবিষ্কার হবার পরে ফ্রয়েডের এই স্বপ্নতত্ত্ব বেশ ধাক্কা খায়। কারণ বিজ্ঞানীরা প্রাথমিকভাবে দেখিয়েছিলেন যে REM Sleep-এর সঙ্গে স্বপ্নের যোগাযোগ আছে। আর তাই স্বপ্ন সৃষ্টির ক্ষেত্রে উচ্চতর মস্তিষ্কের বা higher cognitive function-এর কোন ভূমিকা নেই। স্বপ্ন ব্যক্তির অবদমিত ইচ্ছার পূরণের রাস্তা — ফ্রয়েডের এই মতকে তাঁরা পুরোপুরি নস্যাৎ করে দিয়ে বলেন যেহেতু REM SLEEP আর স্বপ্ন একই সময়ে হচ্ছে সেখানে স্বপ্ন হল সম্পূর্ণ যান্ত্রিক প্রক্রিয়া। কিন্তু মার্ক জল্ম (Mark Solm)-এর গবেষণা আবার ফ্রয়েডের তত্ত্বকে প্রাসঙ্গিক করে তোলে। জল্মের গবেষণা প্রমাণ করে — প্রথমত, REM sleep-এর সঙ্গে স্বপ্ন দেখার সরাসরি যোগাযোগ নেই। আমরা বলতে পারি

না একমাত্র REM Sleep-এই মানুষ স্বপ্ন দেখবে। দ্বিতীয়ত, মস্তিষ্কের যে অংশ REM sleep তৈরি করে সেই অংশ অপারেশনে বাদ গেলেও সেই ব্যক্তি স্বপ্ন দেখেন। তৃতীয়ত, স্বপ্নের সঙ্গে মানুষের উচ্চতর মানসিক প্রক্রিয়াও জড়িত। মস্তিষ্কের ছবির মাধ্যমে প্রমাণ হয় স্বপ্নের সঙ্গে মস্তিষ্কের উচ্চতর অংশ (Frontal Lobe of Cerebral Cortex) এবং নিম্নতর অংশ (Limbic Lobe) দুটিই ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। এর পরে ড্যানিয়েল ওয়েগ্নার (Daniel Wegner) ২০০৪ সালে তাঁর গবেষণায় দেখান মানুষ জোর করে অবদমিত বিষয়ের ওপরই স্বপ্ন বেশি দেখে। এই সমস্ত গবেষণা ফ্রয়েডের তত্ত্বকে আবার প্রাসঙ্গিক করে তোলে এবং Psychoanalysis-এর সঙ্গে Neuropsychology-এর মেলবন্ধন ঘটিয়ে নতুন গবেষণার পথ Neuropsychoanalysis সৃষ্ট হয়। তবে ফলে পৃথিবীর মনোবিজ্ঞানের ইতিহাসে ফ্রয়েডের লেখা Interpretation of Dreams বইটি সর্বদা একটি আকর গ্রন্থ হিসেবেই সমাদৃত হবে।

যদিও Neuropsychoanalysis-এর গবেষণা এখনো ফ্রয়েডের Psycho-sexual stages, Oedipal Conflict, Castration Anxiety ইত্যাদি নিয়ে কোনো যুক্তিগ্রাহ্য তত্ত্ব প্রকাশ করতে পারেনি, ফ্রয়েডের এই যৌনতার তত্ত্ব এখনো পর্যন্ত তর্কের বিষয়।

ভারতে ফ্রয়েডের তত্ত্ব নিয়ে প্রথম কাজ করেন গিরীন্দ্রশেখর বসু। কিন্তু ফ্রয়েড পড়ার আগেই গিরীন্দ্রশেখর নিজেই রিপ্রেশন (Repression) বা অবদমন পদ্ধতি নিয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন। ভারতে ফ্রয়েডের অনুবাদ এসে পৌঁছায় ১৯২১ সাল নাগাদ। আর গিরীন্দ্রশেখরের ডি. এস. সি. থিসিস 'কনসেপ্ট অফ রিপ্রেশন' প্রকাশিত হয় ১৯২১ সালে। এটি প্রকাশিত হবার পরেই তিনি এটি ফ্রয়েডের কাছে পাঠান। গিরীন্দ্রশেখর বসুর কাজ দেখে ফ্রয়েড বিস্মিত ও আনন্দিত হয়েছিলেন। যদিও দুজনের চিন্তা-ভাবনার মধ্যে ঈষৎ ফারাক ছিল।

গিরীন্দ্রশেখর বসু ছোটবেলা থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। কেমিস্ট্রি ও ফিজিওলজি নিয়ে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান পেয়ে বি.এস.সি পাশ করেন। এম.এস.সি.তেও বিজ্ঞানের সমস্ত শাখার মধ্যে প্রথম হয়েছিলেন। মানুষের মন নিয়ে গিরীন্দ্রশেখরের আগ্রহ প্রথম থেকেই ছিল। তিনি কিশোর বয়স থেকেই জাদু ও হিপনোটিজমের ওপর অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। ডাক্তারি পড়ার সময় তিনি 'যোগী গিরীন্দ্রশেখর' নামে বিভিন্ন জায়গায় ম্যাজিক শো করতেন। হয়তো এই আগ্রহই তাঁকে মানুষের মনের বিশ্লেষক হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করেছে।

গিরীন্দ্রশেখর বসুই ভারতে মনঃসমীক্ষণ-এর জনক। ১৯২২ সালে গিরীন্দ্রশেখরের সভাপতিত্বে গড়ে ওঠে ভারতীয় মনোসমীক্ষক সমিতি। ভারতীয় সাহিত্য, দর্শন, পুরাণ, ইতিহাস এবং তার সঙ্গে বিজ্ঞানে অগাধ পাণ্ডিত্য থাকায়

গিরীন্দ্রশেখর বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের মননে কীভাবে মনোবিজ্ঞানের প্রসার ঘটানো যায় তার জন্য বিভিন্ন পত্রিকায় লেখা শুরু করলেন। তাঁর বাড়ির বৈঠকখানাতেও নিয়মিত বসত শহরের বিশিষ্ট মনোবিদদের আলোচনার আসর — তিনি এর নামকরণ করেছিলেন 'উৎকেন্দ্র সমিতি'। এতে যোগ দিতেন অন্যান্য শাখার বুদ্ধিজীবী মানুষেরা। উদ্দেশ্য ছিল নাগরিকদের জ্ঞান চর্চা।

গিরীন্দ্রশেখর বসু ফ্রয়েডের এই স্বপ্নতত্ত্বকে নিয়ে বই প্রকাশিত করেন ১৯২৮ সালে। তবে তার আগেই গিরীন্দ্রশেখর বিভিন্ন পত্রিকাতে প্রবন্ধ আকারে এই লেখা প্রকাশিত করছিলেন এবং তা জনপ্রিয় হয়েছিল। এটি গিরীন্দ্রশেখর বসুর প্রথম লেখা বাংলা বই যেখানে খুব সহজ ভাষায় ফ্রয়েডের এই জটিল তত্ত্ব আমাদের কাছে তুলে ধরেন। ফ্রয়েড বা গিরীন্দ্রশেখর দুজনেই স্বপ্ন ব্যাখ্যাকে হাতিয়ার করে মানুষের অবচেতন মনের সন্ধান পেতে চেয়েছিলেন।

Interpretation of Dreams পড়তে গিয়ে আমরা ফ্রয়েডের মূল বই-এর ইংরাজি অনুবাদ পড়ে থাকি। কিন্তু গিরীন্দ্রশেখর বসু যখন তাঁর স্বপ্ন বইটা লিখলেন তখন ফ্রয়েডের বই-এর বাংলা অনুবাদ করলেন না। বরঞ্চ ফ্রয়েডের তত্ত্বের নির্যাস লিখলেন তাঁর নিজের ভাষায়। সঙ্গে কিছু তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারাও লিখলেন। ফলে বাঙালি পাঠকদের কাছে গিরীন্দ্রশেখর বসুর লেখা 'স্বপ্ন' এক অন্য মাত্রা পেয়ে গেল। এই বইটির প্রথম প্রকাশ ১৯২৮ সালে আর তারপরে বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা থেকে বহুবার বইটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। এই লেখকের কাছে যে বইটি আছে সেটির চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে এপ্রিল ২০১৩-তে। ফলে বোঝাই যাচ্ছে বাঙালী পাঠকদের মাঝে এর জনপ্রিয়তা এখনো বিদ্যমান। এই বইটি লেখার ক্ষেত্রেও গিরীন্দ্রশেখর বসুর সেরকমই উদ্দেশ্য ছিল। তিনি চেয়েছিলেন বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ফ্রয়েডীয় মতবাদকে প্রচার করে চিন্তা ভাবনার এক গভীর দিক উন্মোচন করা। আমরা বাংলা সাহিত্যে — কবিতায় জীবনানন্দ দাশ, বা উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বা নাটকে মোহিত চট্টোপাধ্যায়কে যেভাবে পাই তার পরে এমনটা কি হলফ করে বলতে পারি যে তাদের চিন্তা ধারার মধ্যে ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের কোনো প্রভাব পড়েনি? জীবনানন্দের প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯২৮ সালে। এই প্রসঙ্গে অবশ্যই আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ হতে পারে।

'স্বপ্ন' বইটি লেখার পেছনে গিরীন্দ্রশেখর বসুর আরেকটি উদ্দেশ্য কাজ করেছিল। তা হল ফ্রয়েডের পাশাপাশি তাঁর নিজস্ব মতবাদ বলা। ফ্রয়েডের মতে শিশুকাল থেকেই মানুষের মনে কামজ আর আগ্রাসী ইচ্ছা থাকে। সামাজিক প্রথা, ধর্মীয় অনুশাসন, শিক্ষা ইত্যাদির ফলে শিশুমনে যে সুপার ইগো জন্মায় তার প্রভাবে এই কামজ চিন্তা অবচেতনে চলে যায়। মনঃসমীক্ষণের সাহায্যে রোগীর মনের এই অবরুদ্ধ ইচ্ছাকে নির্ণয় করে, সে সম্বন্ধে ব্যক্তিকে সচেতন করে তোলাই ফ্রয়েডের

চিকিৎসা পদ্ধতি। কিন্তু গিরীন্দ্রশেখর বসুর মতে প্রতিটা ইচ্ছার একটি বিরুদ্ধ ইচ্ছাও থাকে। যেমন — আমার যদি টাকা খরচ করার ইচ্ছা থাকে, টাকা সঞ্চয়ের ইচ্ছাও থাকবে। একটা ইচ্ছা আরেকটি ইচ্ছার তুলনায় তীব্র হলে সেইটা অন্যটাকে অবচেতন মনে পাঠিয়ে দেবে। সামাজিক প্রথা, ধর্মীয় অনুশাসন, শিক্ষা ইত্যাদি বহির্জগতের বাধানিষেধ এই পরস্পর বিরোধী ইচ্ছা দুটির একটিকে চাগিয়ে তোলে আর সেই তীব্র ইচ্ছার প্রভাবে তার বিপরীত ইচ্ছাটি অবচেতনে নির্বাসিত হয়। এই অবদমিত ইচ্ছা কখনো বিভিন্ন ছদ্মবেশে নানান প্রতীক অবলম্বন করে সন্তুষ্টি পেতে চায়। স্বপ্নে, নানা প্রতীকের মধ্য দিয়ে এই অবদমিত ইচ্ছার পরিতৃপ্তির প্রয়াস বুঝতে পারা যায়। এমনভাবেই গিরীন্দ্রশেখর বসু তাঁর বইয়ে একের পর এক অনুচ্ছেদে ফ্রয়েডীয় পদ্ধতির নির্যাস বর্ণনা করেছেন এবং বেশ কিছু জায়গায় নিজের প্রশ্ন এবং নিজের মতবাদও রেখেছেন।

গিরীন্দ্রশেখরের মতে প্রাথমিকভাবে কোনো অপ্রিয় মানসিক অনুভূতি নেই। ভালবাসা আর সুখবোধই 'প্রাথমিক অনুভূতি' এবং প্রতিটি ইচ্ছাপূরণই সুখের সৃষ্টি করে। কিন্তু দুই বিরুদ্ধ ইচ্ছার দ্বন্দ্ব ও একটি ইচ্ছার অবদমনের ফলে অপ্রিয় ও অসুখকর অনুভূতি তৈরি হয়। Theory of opposite wish ছাড়াও গিরীন্দ্রশেখর বসু আরও কিছু বিষয়ে ফ্রয়েড থেকে সরে এসেছেন। না, তিনি ইয়োরোপের অনেক মনোবিদদের মত ফ্রয়েডের সমালোচনা করেননি বরং ফ্রয়েডকে গ্রহণ করেছেন ভারতীয় সংস্কৃতির আলোকে। গিরীন্দ্রশেখর বসুর মতে ভারতীয় পুরুষদের মধ্যে Castration Threat খুব একটা দেখা যায় না যেমনটা ইয়োরোপের পুরুষদের মধ্যে দেখা যায়। তিনি বলেন ভারতীয় পুরুষদের মধ্যে বরঞ্চ মহিলাসত্তাতে পরিবর্তিত হবার ইচ্ছা অনেক প্রবল থাকে। এই কথা তিনি ফ্রয়েডকে একটি চিঠিতে লিখে জানান (১১ এপ্রিল ১৯২৯)। এমনকি তিনি ফ্রয়েডকে Homosexuality নিয়ে তাঁর রিসার্চ পেপার পড়ে দেখতে অনুরোধ করেন। গিরীন্দ্রশেখর বসু ফ্রয়েডের বিরোধিতা না করেই নিজের তত্ত্ব নিয়ে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। প্রাবন্ধিক অমিত রঞ্জন বসুর মতে "গিরীন্দ্রশেখর বসু ভারতীয় দর্শনের অন্তর্দৃষ্টিমূলক পদ্ধতিকে দক্ষতার সঙ্গে প্রয়োগ করে রচনা করেছিলেন এমন এক মনঃসমীক্ষণ যা চেতন মনের সীমান্তে বিরাজ করছিল।"

গিরীন্দ্রশেখর বসুর রচনা বাংলা, ইংরাজি মিলিয়ে একশোর কাছাকাছি। তিনি সাইকোঅ্যানালিসিস বা মনঃসমীক্ষণ-এর মত একটা গভীর বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন তাঁর মাতৃভাষায় অত্যন্ত সাবলীল ও সহজ ভাষায়। অথচ জটিল বিষয়কে কোথাও একটুও লঘু করেননি। শুধু 'স্বপ্ন' নয় এই প্রসঙ্গে তাঁর আরেকটি উল্লেখযোগ্য বই 'গীতা'র উল্লেখ করা যেতে পারে। আমাদের সাধারণ জীবনের উদাহরণ দিয়ে তিনি 'গীতা'র মত শাস্ত্র আলোচনা করেছেন। গিরীন্দ্রশেখরের আরও

একটি উল্লেখযোগ্য অবদান, 'স্বপ্ন' বইটির শেষে শক্ত শক্ত ইংরাজি পারিভাষিক শব্দের সহজ বাংলা প্রতিশব্দ দিয়ে গেছেন যা বাংলায় মনোবিদ্যা চর্চার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ।

বর্তমানে মনোবিজ্ঞানের চর্চা অনেকটাই ইংরাজি ভাষা নির্ভর হয়ে পড়েছে। বাংলাতে মনোবিজ্ঞানের বিশেষ আকর গ্রন্থ হিসেবে একমাত্র গিরীন্দ্রশেখর বসুর লেখা 'স্বপ্ন'কেই ধরতে হবে। আগেই যেমন বলেছি বইটির তত্ত্বগত গুরুত্ব যেমন অপরিসীম তেমন সাহিত্যগুণও অসাধারণ। প্রায় একশ বছর আগে লেখা যদিও সাধু ভাষার প্রয়োগ রয়েছে তবুও সেই ভাষা জটিল ভাষাতে আবদ্ধ নয়। সমগ্র পৃথিবীর মনোবিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনাতে ফ্রয়েডের ইন্টারপ্রিটেশন অফ ড্রিমস যেমন একটি আকর গ্রন্থ তেমন আমাদের বাংলা দেশের মনোবিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনাতে গিরীন্দ্রশেখর বসুর 'স্বপ্ন'-ও একটি বিশেষ আকর গ্রন্থ। ❑

তথ্যসূত্র :

১। অমিত রঞ্জন বসু, 'ভুঁইফোড়ের মনোবিদ্যাচর্চা' অনুষ্টুপ ২০০৯, পাতা ১৫৫-২০১

২। গিরীন্দ্রশেখর বসু, 'স্বপ্ন' ১৯২৮, চতুর্থ সংস্করণ ২০১৩, বিবেকানন্দ বুক সেন্টার, কলকাতা

৩। পুষ্পা মিশ্র, 'সিগ্মুন্ড ফ্রয়েড', ২০১৪ এবং মুশায়েরা

৪। সুনীল কুমার সরকার, 'ফ্রয়েড' ১৯৮০ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

৫। A. A. Brill, 'The Basic Writings of Sigmund Freud' 1938 Random House, USA pages 32-78

৬। Jess Feist and Gregory J. Feist, Theories of Personality, 2005. Mc. Grew Hill, New York Pages 17-44

৭। Stephen A. Mitchell and Margaret J. Black, Freud and Beyond.1995 Basic Books, USA Pages 22-34